সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

লেখকের কথা ৯

নিয়ামতের পরিচয় ১২

কেন আমাদের নিয়ামত দেওয়া হয়?.....১৮

আল্লাহ কেন আমাদের কৃতজ্ঞ দেখতে চান? ২৫

কীভাবে কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন?..... ৩০

অকৃতজ্ঞতার শাস্তি..... ৩৬

শয়তানের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা ৪১

শয়তানের পরিকল্পনা ৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

অকৃতজ্ঞ ইবলিস ৫০

অকৃতজ্ঞ কারূন ৫৪

অকৃতজ্ঞ ফিরাউন..... ৬০

অকৃতজ্ঞ সাবা জাতি ৬৫

অকৃতজ্ঞ আদ জাতি.....৭০

অকৃতজ্ঞ বনি ইসরাইল জাতি ৭৪

তৃতীয় অধ্যায়

নিয়ামত হারানোর বাস্তব উদাহরণ.....৭৮

নিয়ামতের গলা চেপে ধরা.....৮৭

কৃপণতা নিয়ামত কেড়ে নেয় ৯১

বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তির পরীক্ষা.....৯৫

নিয়ামত হারিয়ে গেলে কী করণীয়?.....৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

নিয়ামত:১—জীবন.....১১২

নিয়ামত: ২— সুস্থ শরীর, সুস্থ মন.....১২২

নিয়ামত: ০৩—চোখ ১২৯

নিয়ামত: ০৪—শ্রবণশক্তি ১৩৬

নিয়ামত: ০৫—বাকশক্তি ও জিহ্বা.....১৪১

নিয়ামত: ০৬—হাত.....১৪৮

নিয়ামত: ০৭—পা.....১৫৪

নিয়ামত: ০৮—নিঃশ্বাসের সহজতা.....১৫৮

নিয়ামত:০৯ — জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা.....১৬১

নিয়ামত: ১০ —মানসিক প্রশান্তি ও আত্মিক শক্তি.....১৬৫

নিয়ামত: ১১—একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা.....১৭০

নিয়ামত: ১২—ভাষা ও সাহিত্য ১৭৮
নিয়ামত: ১৩—মানব মস্তিষ্ক.....১৮৩
নিয়ামত: ১৪—দুআর তাওফিক.....১৮৮
নিয়ামত: ১৫—তৃপ্তি সহকারে খাওয়া..... ১৯৬
নিয়ামত: ১৬—ইবাদতের শক্তি.....২০০
নিয়ামত: ১৬—মোবাইল ফোন ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ২০৩
নিয়ামত: ১৭—যানবাহন ২১৪
নিয়ামত: ১৮—ঋতু ও জলবায়ুর পরিবর্তন.....২১৭
নিয়ামত: ১৯—বৃষ্টি ২২০

পঞ্চম অধ্যায়

চলুন, জান্নাতের নিয়ামত দেখে আসি.....২২৪
নবিজির ﷺ সঙ্গে সাক্ষাৎ, জান্নাতের অন্যতম নিয়ামত..... ২৩৪
কল্পনায় এঁকেছিলেন যেই চিত্র..... ২৩৭
আসুন দুআ করে শেষ করি.....২৪২

নিয়ামতের পরিচয়

নিয়ামত শব্দটি আরবি, যার অর্থ—অনুগ্রহ, কল্যাণ বা দান। ইসলামের দৃষ্টিতে নিয়ামত হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত সব ধরনের অনুগ্রহ ও দয়া—যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য প্রেরিত।

নিয়ামতকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—

১. দুনিয়াবি নিয়ামত:

দুনিয়াবি নিয়ামত আবার তিন প্রকার:

(ক) শারীরিক নিয়ামত

এটি এমন নিয়ামত, যা সরাসরি আমাদের দেহের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন—সুস্থ-সবল দেহ, বাহ্যিক সৌন্দর্য, চক্ষু-দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি, সুগন্ধি ও স্বাদ অনুভব করার ক্ষমতা, হাত-পা ও অনুভূতি শক্তি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—"আমি কি তার জন্য দু'টি চোখ বানাইনি? আর একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট?"[১]

(খ) সম্পদের নিয়ামত

এটি মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। যেমন—অর্থ, সোনা-রুপা, বাসস্থান, ফসলি জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যানবাহন (গাড়ি, উট, ঘোড়া)।

[১] সূরা বালাদ, আয়াত: ৮-৯

অকৃতজ্ঞ সাবা জাতি

কখনো কি এমন শহরের কথা শুনেছেন—যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দুনিয়াবি নিয়ামত এক হয়ে গিয়েছিল? এমন জনপদের কথা শুনেছেন, যেখানে কোনো কিছুর কমতি ছিল না? যেখানে মানুষের ঘরে দরিদ্রতা ছিল না, ছিল না চোখে অশ্রু? যেখানে মানুষ ফুলের উপর পা দিয়ে ফলের বাগানে হাঁটত, শুনেছেন এমন কোন জনপদের কথা?

ভাবছেন হয়তো পৃথিবীতে আবার এমন জনপদ থাকতে পারে? হ্যাঁ, এমন একটি অভাবমুক্ত নিয়ামতে ভরপুর একটি জনপদ ছিল। জনপদটির নাম ছিল সাবা। সাবা ছিল এক সমৃদ্ধ জনপদ। এটি এমন একটি জনপদ, যেখানে আল্লাহ অসীম নিয়ামত দান করেছিলেন। শহরের দুই পাশে ছিল উঁচু উঁচু পাহাড়। এ পাহাড়ের সৌন্দর্য শহরকে আরও বেশি আলোকিত করে রাখত। মনে হতো সকল সৌন্দর্য পাহাড় বেয়ে শহরে এসে নেমেছে। সেখানে ছিল অসংখ্য-অগণিত ঝর্ণা ও নালা। এই ঝর্ণা ও নালার পানিতে বাগানগুলো সতেজ থাকত। সেখানে অবস্থিত পর্বতের মাঝে নির্মাণ করা হয়েছিল বাঁধ। যার ফলে পানির প্রবাহ ছিল নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খল। পানিগুলো এদিক-সেদিক না গিয়ে, সরাসরি বাগানগুলোতে পৌঁছত। ফলে, প্রচুর পরিমাণে শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন হতো।

শহরের ডান ও বাঁ পাশে ছিল বিস্তৃত ফলের বাগান। এসব বাগানে প্রবাহিত হতো খালের পানি—যা সব সময় বাগানগুলোকে সজীবতা দিয়ে সতেজ রাখত। মোটকথা, গোটা সাবা জনপদ সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনানীতে ভরা ছিল। শহরের যেকোনো জায়গায় দাঁড়ালেই দেখা যেত, সারি সারি বাগান। এ বাগানগুলো এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, পরস্পর সংলগ্ন হয়ে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই বাগানগুলোতে সব ধরনের ফলমূল উৎপন্ন হতো। গাছগুলো প্রচুর পরিমাণ ফল দিত। কাতাদাহ (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, সাবার কোনো ব্যক্তি যদি খালি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেত, তাহলে গাছ থেকে ঝরে পড়া ফল দিয়েই তার ঝুড়ি আপনা-আপনি ভরে যেত। এমনকি, ফল সংগ্রহ করার জন্য হাত লাগানোরও প্রয়োজন হতো না।

শুধু কৃষিক্ষেত্রেই নয়, সাবাবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উন্নত ছিল। স্থল ও জলপথের বাণিজ্যের জন্য দেশটি ছিল বেশ প্রসিদ্ধ। ধন-সম্পদ, খাদ্য ও জীবনযাত্রার মান—সব দিক থেকেই তারা সমৃদ্ধশালী এক জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল।

আল্লাহ তা'আলা শুধু সম্পদের অফুরন্ত ভান্ডারই দেননি, সাবা'র মানুষদের দিয়েছেন বিশুদ্ধ পরিবেশও। শহরটি ছিল স্বাস্থ্যকর। ছিল না কোনো রোগ-ব্যাধির প্রভাব। আবহাওয়া ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। না ছিল মশা, না মাছি। না সাপ, না বিছা। শুধু তাই নয়, বাইরের কেউ যদি উকুন কিংবা জীবাণু নিয়ে ঢুকত, সেটা শহরে ঢুকেই মরে যেত। এমন পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ শহর দুনিয়াতে বিরল। এ ছিল এক অস্বাভাবিক নিয়ামতে ভরা জনপদ।

সাবা'র জনপদ ছিল সুখী, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ নগরী। আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামতে ভরা এক সুখী জীবন দান করেছিলেন। তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল অফুরন্ত নিয়ামত। আর এই নিয়ামত উপভোগ করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশও দিয়েছিলেন।

তাদেরকে বলা হয়েছিল—"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রিজিক ভোগ করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এই নগরী অত্যন্ত মনোরম ও স্বাস্থ্যকর, আর তোমাদের প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল।"[১]

তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে, তা তোমরা ভোগ করো এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

[১] সূরা সাবা, আয়াত: ১৫

করার অর্থ ছিল—আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা। এই নিয়ামতের সাহায্যে সৎকর্ম করা। নীতি অনুসরণ করা। আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা।

আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেন, তখন তাদের দায়িত্ব হয় সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং আল্লাহর আনুগত্য করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাবা'র জনগণ এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে যায়। তারা এত এত নিয়ামত পাওয়ার পরেও কৃতজ্ঞতা আদায় করেনি।

তারা এই নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। সীমালঙ্ঘন করতে শুরু করে। শাসকগণ ও ধনী লোকেরা অবৈধভাবে সম্পদ ভোগ করতে শুরু করে। সমাজে বাড়তে থাকে পাপাচার ও অবৈধ কর্মকাণ্ড। ধীরে ধীরে তারা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের মূল্য হারিয়ে ফেলে। অহংকারে মত্ত হয়ে শয়তানের পথ অনুসরণ করতে শুরু করে।

তাদের এই অকৃতজ্ঞতা ও পাপাচার যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সতর্ক করার জন্য নবিদের মাধ্যমে উপদেশ দিলেন। নবিরা তাদের বললেন, এই নিয়ামত ভোগ করো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

কিন্তু তারা তা মানল না। নবির কথায় কর্ণপাত করল না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না। উল্টো আরও অহংকারী হয়ে উঠল। তাদের পাপাচার বাড়তে থাকল। নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী মনে করতে শুরু করল।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত শাস্তি পাঠালেন। কুরআনে বলা হয়েছে—"তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধভাঙা বন্যা প্রবাহিত করলাম। আর আমি তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় তিক্ত ফলের গাছ, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কিছু কুল গাছ।"[১]

[১] সূরা সাবা, আয়াত: ১৬

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, সাবাবাসীদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক ভয়ানক বন্যা দিয়ে—যা ইতিহাসে 'সাইলুল আরিম' নামে পরিচিত। আর ধ্বংসের কারণ ছিল তাদের অকৃতজ্ঞতা।

সাবা'র জনগণ যে বাঁধটি তৈরি করেছিল, তা ছিল তাদের কৃষি এবং অর্থনীতির মূলভিত্তি। বাঁধের মাধ্যমে তারা পাহাড় থেকে প্রবাহিত পানি নিয়ন্ত্রণ করত এবং তা দিয়ে তাদের শস্যক্ষেত্র ও বাগানগুলোকে সেচ দিত।

কিন্তু আল্লাহর শাস্তি যখন নেমে এলো, তখন তিনি প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটালেন। একটানা বর্ষণের ফলে সেই বিশাল বাঁধ ভেঙে গেল। শুরু হলো আকস্মিক বন্যা। এই বন্যায় ভেসে গেল পুরো জনপদ। এক রাতেই তাদের সবুজ-শ্যামলে গড়ে ওঠা জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পড়ে রইল এক ধ্বংসস্তূপ হয়ে। যে জমিগুলোতে প্রচুর ফলমূল উৎপন্ন হতো, সেগুলো অনুর্বর ও শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হলো। একসময় যেখানে সবুজ বাগান ছিল, সেখানে জন্মালো তিতা গুল্ম, কাঁটাযুক্ত লতা এবং অনুর্বর বৃক্ষ।

সাবা'র জনপদের ঘটনা আমাদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা। আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেন, তখন তাদের দায়িত্ব হলো সেই নিয়ামত যথাযথভাবে ব্যবহার করা। তার কদর করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পাশাপাশি সৎকর্ম করা, আল্লাহর আনুগত্যে থাকা, এবং তাঁর দানকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো। অন্যথায় অবহেলা ও অকৃতজ্ঞতার ফলে সেই নিয়ামত একসময় হারিয়ে যেতে পারে, ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আর নিয়ামত হারিয়ে গেলে কেউ কেবল নিয়ামত থেকেই বঞ্চিত হয় না, সাথে সাথে নিজেরাও বিপদে পড়ে।

সাবাবাসী কেন ধ্বংস হয়েছিল? তারা কি তাদের প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল? তারা কি সেই নিয়ামত ধরে রাখতে পেরেছিল, নাকি অকৃতজ্ঞ হয়ে নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে এনেছিল?

তারা নিজেরাই নিজেদের কারণে ধ্বংস হয়েছিল। তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল না, নিয়ামতের কদর করেনি। আল্লাহ তা'আলা শুধু শুধু তাদেরকে ধ্বংস করেননি। আল্লাহর একটি নিয়ম হলো, তিনি কখনোই কাউকে বিনা কারণে শাস্তি দেন না। তিনি প্রথমে মানুষকে সতর্ক করেন, তাদের জন্য বিভিন্ন নিদর্শন পাঠান, যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে। সাবাবাসীদের ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছিল। তাদেরকে বারংবার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। বারবার তাদের কাছে উপদেশ পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা সেগুলো অগ্রাহ্য করেছিল। ফলস্বরূপ, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

এই ঘটনার শিক্ষা কী?

আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়। এই নিয়ামত আমাদের জন্য এক পরীক্ষা। এই নিয়ামত দানের মাধ্যমে তিনি দেখতে চান, আমরা তা কী করি, কীভাবে ব্যবহার করি।

যখন আমরা কৃতজ্ঞ হই, তখন আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। আর যখন অহংকার করি, পাপের পথে হাঁটি, তখন সেই নিয়ামতের নিচেই আমরা চাপা পড়ি। অতঃপর, ধ্বংসের মুখে পড়ে নিজেদের ক্ষতি করি। যেমন করে নিজের ক্ষতি নিজে ডেকে ধ্বংস হয়েছিল সাবাবাসী।

ভাবুন আমরাও কি নিয়ামতের কথা ভুলে যাচ্ছি না? আমরাও কি আল্লাহর নিয়ামতকে নিজের অর্জন ভাবছি না? যদি ভাবি, তাহলে এখনই থেমে যান। নিয়ামতকে কদর করুন, তাকে যথাযথ ব্যবহার করুন। কৃতজ্ঞ হন।

চলন্ত মানুষটা হঠাৎ থেমে গেল। সব দৌড়ঝাঁপ থেমে গেল। ব্যবসার ফাইল, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট, ক্লায়েন্টের মেইল—সবকিছু এখন অপেক্ষার তালিকায় চলে গেল। এখন তার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব—বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ানো।

অথচ, চাইলে তিনি আরও অনেক বছর স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের উপর এতটাই চাপ প্রয়োগ করেন যে, সুস্থতার নিয়ামতটুকুও হারিয়ে ফেলেন তিনি।

এই ঘটনা থেকে আমরা কী শিখলাম?

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা শিখলাম—সুস্থতা নিছক শরীরের অবস্থা না, এটা এক অদৃশ্য নিয়ামত। আপনি হাসতে পারেন, চলতে পারেন, ঘুমাতে পারেন—এই ছোটো ছোটো কাজগুলোর পেছনেও রয়েছে বিরাট নিয়ামত। আপনি বুঝতেই পারছেন না, অথচ ভোগ করছেন ঠিকই।

আমাদের উপর আমাদের শরীরের হক আছে। সুস্থতা ধরে রাখার পদ্ধতি আছে। আমরা যদি এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন না করে শরীরের উপর চাপ প্রয়োগ করি, তবে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়বে। অতিরিক্ত চাপে পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তখন আমরা এই মূল্যবান নিয়ামতটিও হারিয়ে বসব।

আমরা ভাবি, আমাদের জীবনের সময় অনেক কম। যদি এই সপ্তাহের মধ্যে কাজটা সম্পন্ন না করি, তাহলে কোনো কিছুই হবে না। ভাবি, দ্রুত কাজ শেষ করলেই বুঝি সময় বেঁচে যাবে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে নিজের উপর এতটাও চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়, যতটা চাপ আমাদের শরীর ও মস্তিষ্ক নিতে পারে না। যদি সময় বাঁচাতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করে ফেলি, তবে এই "বাঁচানো সময়"-ই একদিন হাসপাতালের বিছানায় কেটে যাবে। তখন আর কোনো কাজ হবে না। তখন টাকা দিয়ে সময় কেনা যাবে না। চোখের পানি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাই সময় থাকতে নিজেকে বুঝে নিন। নিজের শরীরকে ভালোবাসুন। সুস্থতাকে ছোটো মনে করবেন না। শরীরের হক আদায় করুন। বিশ্রামের হক আদায় করুন। নিয়ামত হারালে শুধু জিনিস হারায় না, হারায় জীবনের স্বাভাবিকতাও। হারায় হাসির

সম্পদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদি কেউ সম্পদ শুধু জমিয়ে রাখতে চায়, কাউকে কিছু দিতে না চায়, দান-সাদাকা না করে—তবে একসময় এই সম্পদও হারিয়ে যাবে। যদি সম্পদকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন, দেখবেন ধীরে ধীরে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেভাবে, যেভাবে বালুর মুঠো অতিরিক্ত চেপে ধরলে ফসকে যায়।

উদাহরণ ২: ভালোবাসার ক্ষেত্রে অতি-আসক্তি

একটি গাছ বেঁচে থাকার জন্য রোদ ও পানির প্রয়োজন। কিন্তু তাকে বাঁচাতে গিয়ে যদি তার গোড়ায় অতিরিক্ত পানি দেওয়া হয়, তাহলে তার গোড়ায় পচন ধরবে এবং সে মারা যাবে। আপনি হয়তো তাকে ভালোবেসে পানি দেবেন, তার যত্ন নেবেন। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত যত্নই তার মৃত্যুর কারণ হবে।

ভালোবাসাও ঠিক তেমনই। ভালোবাসা মাত্রাতিরিক্ত যত্ন সহ্য করতে পারে না। ভালোবাসার জন্য মাত্রাতিরিক্ত যত্ন হুমকিস্বরূপ। অনেক মা-বাবাই ভালোবাসার নামে সন্তানদের এত বেশি শাসন করেন, যা তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। সন্তানদের মানসিকভাবে বন্দি করে রাখে। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়, মনোভাব বিকৃত হয়।

এই অতিরিক্ত শাসন, কঠোর নিয়ন্ত্রণ—তাদের ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়। তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ হুমকিতে পড়ে যায়। তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। যখন তারা বুঝতে পারে, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে, তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা নষ্ট হচ্ছে—তখনই তাদের মনে জন্ম নেয় বিদ্রোহের আগুন। যে-ই আগুন তার পরওয়ারিশকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। করবেই না কেন? সেই আগুনের উৎসই তো আমাদের অতি-শাসন।

একই ঘটনা দাম্পত্য জীবনেও ঘটে। যদি স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের প্রতি অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ হন, একজন আরেকজনকে যথেষ্ট সময় না দেন, সব সময় প্রশ্নের বেড়াজালে আটকে রাখেন—তবে ভালোবাসার দম বন্ধ হয়ে যায়। ভালোবাসাও

কৃপণতা নিয়ামত কেড়ে নেয়

গ্রামের সীমানায় বিস্তৃত এক বিশাল বাগান। ফুলে-ফলে ভরা এই বাগান। এই বাগানের গাছগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। বাতাসে যেন পাকা ফলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এত স্নিগ্ধতা, এত মিষ্টতা—মুগ্ধতার চাদর টেনে প্রশান্তি আনে।

এই বাগানের মালিক ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। তিনি ছিলেন খুবই উদার মনের মানুষ। সব সময় মানুষের উপকারে দু'হাত প্রশস্ত করে দিতেন। প্রতি বছর বাগানে যখন ফল পাকত, তিনি নিজেও খেতেন, আবার গরিব-দুঃখীদেরকেও দিতেন। গরিবদের জন্য সব সময় বাগানের দরজা খোলা থাকত। যে কেউ প্রবেশ করে ফল নিতে পারত। কোন বাধা ছিল না, ছিল না কোনো শর্ত। তারা বাগান থেকে তো ফলমূল নিতই, পাশাপাশি তিনি নিজেও ডেকে এনে তাদেরকে ফল দিতেন। তাদেরকে বলতেন—"এসো, তোমাদের জন্য যা নির্ধারিত, তা নিয়ে যাও। এটা আমার নয়, আল্লাহর দান।"

গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলো হাসিমুখে ফল নিয়ে যেত। তার জন্য দুআ করত। বাগানের মালিক তা দেখে খুশি হতেন, প্রশান্তি লাভ করতেন। শান্ত মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনি জানতেন, নিয়ামতের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হলো তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং অন্যদের উপকারে লাগানো।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিন। বাগানের মালিকের বয়স বাড়তে থাকে। বয়োঃবৃদ্ধি হয়ে একদিন তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পর বাগানসহ সমস্ত সম্পত্তি চলে যায় উত্তরসূরিদের হাতে।

বাগানের মালিকের ছিল তিন ছেলে। তারা ছিল বাবার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাবার মন ছিল উদার, ছিলেন দানশীল। অপরদিকে সন্তানরা ছিল পাষাণ, ছিল তাদের কৃপণতার বদভ্যাস। তারা মনে করত, এই বাগান তো আমাদের। এই সম্পদের মালিক আমরা। আমাদের উচিত এই বাগান থেকে প্রচুর সম্পদ অর্জন করে নেওয়া। আমাদের উচিত এখান থেকেই ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখা।

একদিন বড় ভাই বলল, "আমরা এবার বাবার মতো বোকামি করব না। এই বাগানের একটি ফলও গরিবদের দেব না। বাগান আমাদের, ফলও আমাদের। তাহলে অন্যরা কেন পাবে?"

মেঝো ভাই বলল, "ঠিক বলেছ। এত কষ্ট করে আমরা বাগান দেখাশোনা করি, এত খাটাখাটুনি করি, আর বিনা পরিশ্রমে ফল ভোগ করবে অন্য কেউ? এটা হতেই পারে না। এমনটা হতে দেওয়া যায় না। এবার থেকে সব ফল আমরা নিজেদের জন্য তুলব।"

তৃতীয় ভাই একটু চুপ করে রইল। তার হৃদয়ে সামান্য হলেও দয়া বেঁচে ছিল। কিছুক্ষণ পর সে বলল, "ভাই, আমাদের কি আল্লাহর ভয় করা উচিত নয়? যদি আমরা গরিবদের বঞ্চিত করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের এই বাগানের বরকত কেড়ে নেবেন!"

বড় ভাই হাসতে হাসতে বলল, "আরে, এসব পুরোনো কথা। আল্লাহ কিছুই নেবেন না। বাগান তো আমাদেরই। এত বড় বাগান, এত বিশাল বৃক্ষরাজি—এগুলোর কিছুই হবে না।"

ছোটো ভাই যখন আন্তরিকতার পরিচয় দিল, অন্য ভাইয়েরা তার কথা নিয়ে উপহাস করল। শুধু উপহাস করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা সিদ্ধান্ত নিল রাতের আঁধারেই সব ফল তুলে নেবে। ফজরের আগেই তারা তাদের মিশন কমপ্লিট করবে—যাতে কেউ কিছু জানতে না পারে।

পরিকল্পনা সাজিয়ে তারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তারা জানত না, তাদের এই পরিকল্পনার কারণে আকাশে আল্লাহর হুকুম জারি হয়ে গেছে!

আল্লাহ বলেন—"অতঃপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পড়ল, যখন তারা ছিল ঘুমন্ত।"[১]

রাত গভীর হলো। হঠাৎ এক ভয়ংকর ঝড় উঠল। প্রবল তাপপ্রবাহ বয়ে গেল বাগানের ওপর দিয়ে। প্রচণ্ড বাতাস আর আগুনের উত্তপ্ত প্রবাহ সবুজ পাতাগুলোকে জ্বালিয়ে দিল। গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ল। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। একসময় যে বাগানে ছিল জীবনের সজীবতা, তা এখন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হলো।

তিন ভাই রাতের প্রথম ভাগে ঘুমিয়ে ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী শেষ রাতে উঠে চুপিচুপি বাগানের দিকে রওনা দিল। চারদিক অন্ধকার। টিপ টিপ পায়ে এগিয়ে চলেছে। হাঁটছে আর ভাবছে—"আজই বাগানের সব ফল তুলে ফেলব। গরিবদের একটাও দেব না। এসব ফল শুধু আমাদের, অন্যদের কোনো অধিকার নেই!"

তারা যখন বাগানের কাছে পৌঁছাল, চোখ কপালে উঠে গেল। চারপাশে ধ্বংসস্তূপ। পুরো বাগান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গাছপালা ফলমূল শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পাতা কিংবা ফল—কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

তারা হতভম্ব হয়ে একে অপরের দিকে তাকাল। কিছুই বুঝতে পারছে না। বড় ভাই ফিসফিস করে বলল, "আমরা কি ভুল জায়গায় চলে এসেছি?"

কিন্তু না, তারা কোন ভুল বাগানে আসেনি, এটাই তাদের বাগান। এটাই সেই বাগান, যে-ই বাগানের জন্য তারা গর্ব করত, যে-ই বাগান তাদের নিজেদের মনে করত।

---

[১] সূরা আল-কলম, আয়াত: ১৯-২০

চারিদিক যখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো, তখন চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তারা ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তারা বুঝতে পারল, তাদের অন্যায় পরিকল্পনার কারণেই এই শাস্তি নেমে এসেছে।

কুরআনে বর্ণিত এই গল্পটি আমাদের কী শেখায়?

কৃপণতা ধ্বংসের কারণ। এটি নিয়ামতকে কেড়ে নেয়। আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে ব্যবহার করা উচিত। নিয়ামত লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়। কৃপণতা করে তা গোপন রাখলে একসময় তা হারিয়ে যাবে। কিন্তু যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়, তবে তা কমবে না; বরং আরও বাড়তে থাকবে।

আল্লাহ যখন কাউকে নিয়ামত দান করেন, তা শুধু তার একার জন্য না। এতে আশেপাশের মানুষ ও গরিব-দুঃখীদেরও হক থাকে। তাই, নিয়ামত পাওয়ার পর তা একা ভোগ করা যাবে না, বরং সবার মধ্যে বণ্টন করতে হবে। যদি মনে করেন বণ্টন করলে কমে যাবে—তাহলে সেটা ভুল ধারণা। আপনি যখন তা অন্যের কল্যাণে ব্যবহার করবেন, তখন নতুন নতুন নিয়ামত আসতে থাকবে। কিন্তু কৃপণতা করে লুকিয়ে রাখলে, নতুন নিয়ামত আসাই বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং, নিয়ামত পাওয়ার পর কৃপণতা নয়; প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করুন এবং অন্যদেরও তা ব্যবহারের সুযোগ দিন। ভবিষ্যতের আশায় সবকিছু জমিয়ে রাখা যাবে না। মনে রাখবেন, নিয়ামত আপনাকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা পুরোপুরি আপনার একার নয়। আল্লাহ অনেক সময় একজন ব্যক্তির মাধ্যমে গোটা সমাজের জন্য নিয়ামত পাঠান। তাই, কার্পণ্য না করে সবার মাঝে বিলিয়ে দিন। কারণ, কৃপণতা করলে আপনি শুধু সম্পদ হারাবেন না, বরকত থেকেও বঞ্চিত হবেন।

আপনি মুগ্ধ হয়ে সামনে এগোতে থাকলেন। সামনে এগোতেই আরেকটি ঝর্ণার মিষ্টি শব্দ কানে এলো। এই ঝর্ণা থেকে পানি কিংবা দুধ নয়, এই ঝর্ণা থেকে ঝরছে মধুর ধারা। আপনার মন চাচ্ছে, একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকেন, হাত বাড়িয়ে একটু মধু পান করেন। কিন্তু আপনি জানেন, দাঁড়ানো যাবে না। সামনেই আরও সৌন্দর্য অপেক্ষা করছে।

আপনি ধীরে ধীরে জান্নাতের আরও গভীরে প্রবেশ করছেন। চারপাশটা এতটাই প্রাণবন্ত, এতটাই সতেজ যে, মনে হচ্ছে আপনি কোনো স্বপ্নের রাজ্যে হাঁটছেন। চারপাশে বইছে কোমল বাতাস। খুবই শান্ত, মোলায়েম। নেই কোনো রুক্ষতা, নেই অতিরিক্ত ঠান্ডা বা বিরক্তিকর গরম। পৃথিবীর বাতাস কখনো হাড় কাঁপিয়ে দিত, কখনো দগ্ধ করে তুলতো। কিন্তু জান্নাতের বাতাস একদম আলাদা।

আপনি আপনার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অন্তরে এক অজানা অনুভূতির জোয়ার। হঠাৎ সামনে উদ্ভাসিত হলো এক অনিন্দ্যসুন্দর প্রাসাদ। এটি সাধারণ কোনো প্রাসাদ নয়। এটি শুধুই আপনার জন্য প্রস্তুত। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন এক প্রাসাদ উপহার দিয়েছেন, যার সৌন্দর্যের তুলনা পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গেই চলে না। বিশাল এই প্রাসাদ খাঁটি সোনা ও রুপা দিয়ে তৈরিকৃত। দেওয়ালগুলো তৈরি হয়েছে সুগন্ধময় মাটির ইট দিয়ে।

যেদিকেই চোখ যায়, রঙের অপূর্ব ছটা, সৌন্দর্যের রাজকীয় ছোঁয়া। প্রাসাদের ভেতরে পা রাখতেই আপনাকে ঘিরে ধরে মোহনীয় অনুভূতি। আকাশ ছোঁয়া আনন্দ, ঝলমলে আলো, আর শান্ত ঝর্ণার কলকল শব্দ—সব মিলে যেন এক স্বপ্নপুরী। আপনি বিস্ময়ে ভাবতে থাকেন, "এত বিশাল, এত সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাসাদ— এগুলো কি সত্যিই আমার জন্য?"

হৃদয়ের গভীর থেকে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মনে পড়ে যায় পৃথিবীর দিনগুলো—মানুষ যেখানে কয়েক হাত জমির জন্য ঝগড়া করত, তর্ক করত। অথচ আজ কোনো কষ্ট ছাড়াই বিনা মূল্যে এমন একটি প্রাসাদের মালিক—যার মূল্য পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়েও অনেক বেশি।

আপনি উপলব্ধি করেন—এ সবই আপনার প্রভুর দয়া, তাঁর সীমাহীন রহমত। কৃতজ্ঞতায় আপনার হৃদয় নত হয়ে যায়। হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত হয়—"আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমার জন্য এমন এক অপরূপ জান্নাত তৈরি করেছেন।"

জান্নাত এমন এক স্থান, যার সৌন্দর্য পৃথিবীর কোনো কিছু দিয়ে মাপা যায় না। মানুষের চোখ যা দেখে, মন যা কল্পনা করে, জান্নাত তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি মুগ্ধকর। আল্লাহ তা'আলা একে এমনভাবেই সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষের কল্পনার সীমানাকেও ছাড়িয়ে যায়।

(দুই)

আপনি এবার আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করলেন। চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো নয়ন জুড়ানো এক বিশাল প্রাসাদ। এই প্রাসাদের চারপাশে নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ—না ঠান্ডা, না গরম।

এমন শান্তিময় পরিবেশ পেয়ে শুয়ে পড়লেন নরম ও আরামদায়ক বিছানায়। এমন আরাম, এমন শান্তি—পৃথিবীতে কোনো দিনও অনুভব করেননি। মনে হলো, এক মুহূর্তেই বুঝি সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। শরীর-মন ভরে উঠল প্রশান্তিতে।

চোখ বন্ধ হতেই মনে পড়ল দুনিয়ার দিনগুলোর কথা—কত দুশ্চিন্তা, কত ব্যস্ততা। তখন বিছানায় গেলেও মাথায় ভর করত হাজারো ভাবনা—ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা, না পাওয়ার যন্ত্রণা, জীবনের টানাপোড়েন। কিন্তু এখানে? এখানে নেই কোনো দুশ্চিন্তা, নেই কোনো অনিশ্চয়তা।

এখানে কিছু হারানোর ভয় নেই। নেই কোনো কষ্টের স্মৃতি, নেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। মনে অস্থিরতা আসে না, আসে না কিছু পাওয়ার জন্য আকুলতাও।

সময় কাটছে নিঃশব্দ আনন্দে। এখানে কোনো রোগ নেই, নেই শরীরের ব্যথা, নেই মনে চাপা কষ্টও। দুনিয়ার জীবনে যতবার অসুস্থতায় কাতর হয়েছেন, ততবার ভেবেছেন—"আরাম কি সত্যিই আছে কোথাও?" আজ সেই প্রশ্নের জবাব নিজেই পাচ্ছেন।

পৃথিবীর অতীত দিনগুলোর কথা হয়তো মাঝেমধ্যে মনে পড়বে, কিন্তু সেগুলো আর বেদনা দেবে না। কারণ, এখানে দুঃখ বলে কিছু নেই। এখানে আছে শুধু শান্তি, আনন্দ আর ভালোবাসা।

এখানেই আপনি থাকবেন চিরকাল। এই সুখ আর শান্তির দিনগুলো আর কখনো শেষ হবে না। এখানে মৃত্যু নেই, ভয় নেই। যেদিন আপনি জান্নাতে প্রবেশ করেছেন, সেদিনই মৃত্যুর পরিচয় হারিয়ে গিয়েছে।

(তিন)

প্রাসাদে অবস্থানকালে আপনার দৃষ্টি গেল এক উঁচু রাজকীয় আসনের দিকে। মনে হলো, এ যেন কোনো বাদশাহর সিংহাসন। ঠিক তখনই আপনার দিকে এগিয়ে এলেন একজন জান্নাতি ফেরেশতা। তাঁর মুখে ছিল হাসি, কণ্ঠে কোমলতা। তিনি বললেন, "এটাই আপনার বিশ্রামের স্থান। আল্লাহ তা'আলা এটা আপনার জন্যই নির্ধারণ করে রেখেছেন।"

আপনি ধীরে ধীরে সেই আসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়েই বুঝলেন এটি সাধারণ কোনো আসন নয়। সোনা-রুপা আর মুক্তার মিশ্রণে তৈরি হয়েছে এর ভিত্তি। চারপাশ অলংকৃত দামি রত্ন দিয়ে। আপনি বসার সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে গেলেন। মনে হচ্ছে আপনি আর আপনার মাঝে নেই।

এবার আপনার সামনে হাজির করা হলো এক অসাধারণ বিছানা। তাতে বিছানো রেশমি চাদর—ঝলমলে, কোমল, আরামদায়ক। বিছানার প্রান্তে সাজানো ফুলগুলো থেকে ছড়াচ্ছে অসাধারণ সুবাস—যা গোটা প্রাসাদকে মোহিত করে রেখেছে।

এই বিছানায় যখন আপনি ঘুমাতে যাবেন, তখন এর প্রশস্ততা অনুভব করতে পারবেন। মনে হবে, এটি দিগন্ত ছাড়িয়ে গেছে। তার শেষ কোথায়, বোঝা যাচ্ছে না। মনে হবে, যেন বিস্তৃত এক অনন্ত প্রশান্তির মাঠ।

কল্পনায় এঁকেছিলেন যেই চিত্র

এক সুন্দর সকালে আপনি বসে আছেন জান্নাতের উঠোনে। চারপাশে বইছে স্নিগ্ধ বাতাস। পাখিরা তাসবিহ পড়ছে। জান্নাতের প্রাসাদ থেকে সুগন্ধি বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলতেই সুদর্শন এক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে। তাঁর চেহারায় এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য, মুখে মৃদু হাসি। তিনি বললেন—"হে জান্নাতবাসী, আজ শুক্রবার, চলুন জান্নাতের বাজারে যাই!"

আপনার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। জান্নাতের বাজার—শুনতেই খুশিতে আঁতকে উঠলেন। ভাবছেন, কী রকম বাজার? কী হতে পারে সেখানে? কেমন হবে সেই জায়গা?

সোনা মাত্রই আপনার তর সইছে না। দ্রুত প্রস্তুত হলেন। জান্নাতের এক সুসজ্জিত বাহনে উঠে বসলেন। বাহনটি সোনার তৈরি। এতটাই সুন্দর যে, পৃথিবীতে এমন বাহন আগে কখনো দেখেননি।

বাহন হেঁটে চলেছে। মনে চাচ্ছে সারাজীবন এই বাহনেই কাটিয়ে দিতে। এত শান্তি আর রোমাঞ্চকর আরোহণ, সত্যিই অকল্পনীয়। সামনে বিস্তৃত এক রাজপথ। পথের দু-পাশে ঝর্না বয়ে যাচ্ছে। এই ঝর্ণার পানির স্বাদ মধুর চেয়েও মিষ্টি। চারপাশে সবুজ বাগান, ফুলের সৌরভে বাতাস ভারী হয়ে আছে।

আপনি আপনার রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন। যে বাহনে চড়েছেন, তাকে হাকাতে হয় না, দৌড়াতেও হয় না; সে আপনা-আপনিই চলে। সে নিজে থেকেই জানে, আপনার গন্তব্য কোথায়। মনে হচ্ছে, সে আগে থেকেই সবকিছু অবগত।

এভাবে চলতে চলতে বিশাল উজ্জ্বল এক জায়গায় পৌঁছে গেলেন। চারিদিক আলোকিত। লোকজনে ভরপুর। চারিদিকে সুন্দর সুন্দর অমায়িক চেহারা।